কাউকে পেছনে রাখা যাবে না

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ব্রিফিং নোট ৩৩

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

'এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ' বৈশ্বিকভাবে গৃহীত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-এর জুনে নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজনদের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিক-ভাবে যাত্রা করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায়, এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক সক্রিয়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গঠিত হয়েছে এবং এর কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টাকে জোরদার করার লক্ষ্যে এবং উন্নয়নের সুফল যাতে পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে পৌঁছায়, সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১২০টির অধিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কোভিড অতিমারির দূর্যোগপূর্ণ সময়কালে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সক্রিয়ভাবে তার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সংলাপ সম্পর্কে

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বিভিন্ন ইস্যুতে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনার পাশাপাশি আঞ্চলিক পর্যায়ে অংশীজনদের ভাবনা জানার জন্য নিয়মিতভাবে সংলাপ ও পরামর্শ সভার আয়োজন করে থাকে। এর ধারাবাহিকতায়, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ২০২২ সালে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, ব্যক্তি খাতের উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী চেম্বার, বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, ব্যক্তি নাগরিক এবং বিশেষত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে বিভিন্ন পরামর্শ সভার আয়োজনের উদ্যোগ নেয়। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে ঠাকুরগাঁও জেলা শহরে একটি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল নাগরিক প্ল্যাটফর্মের পঞ্চম আলোচনা, যার সূচনা হয়েছিল রংপুরে অনুষ্ঠিত পরামর্শ সভা দিয়ে। এরপর পর্যায়ক্রমে খুলনা, টাঙ্গাইল ও সিলেটে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন আখ্যানের সঙ্গে স্থানীয় বাস্তব অভিজ্ঞতার মিল-অমিল সম্বন্ধে শোনা ও তৃণমূলের পরামর্শ অভিজ্ঞতা জানা ছিল এ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ।

নাগরিক পরামর্শ সভা: ঠাকুরগাঁও

তৃতীয় দেশে ট্রানজিট সুবিধা দেয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হলে কম খরচে পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব হবে

সূচনা বক্তব্য

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর আহবায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য নাগরিক প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানান। কেন এমন ঘুরে ঘুরে আলোচনা তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নকে কেন্দ্র করে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গঠন করা হয়েছিল। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘে যে বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচি গৃহীত হয়, তাতে ১৯৩ টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষর করেছিলেন। তবে এসডিজি বাস্তবায়ন শুধু সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এ কারণে সব পর্যায়ের অংশীজনের যথাযথ অংশগ্রহণ দরকার। আর এ কাজে সহযোগিতা করছে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম। এর অংশ হিসেবে আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও নাগরিকের সমস্যা তুলে আনা এবং সমাধানের পথ খোঁজার জন্য এ ধরণের পরামর্শ সভার আয়োজন করা হচ্ছে। সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষ কারা?- তার উদহারণ দিতে যেয়ে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, সরকারি হিসাবে মাথাপিছু আয় পরিবার প্রতি মাসে ৮০ হাজার টাকা। বাংলাদেশের সবার নিশ্চয়ই এমন আয় নেই। এটি হলো গড় হিসাবের অন্তরালে এক ধরণের বিচ্যুতি। যাদের এই ৮০ হাজার টাকা আয় নেই, তারা আসলে পেছনে পড়ে যাচ্ছে। এদের পেছনে ফেলে দেশ

এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাউকে পেছনে ফেলে দেশ এগোতে পারে না। নাগরিক প্ল্যাটফর্মের চেষ্টা হলো, যারা পেছনে পড়ে যাচ্ছে এবং আছে, তাদের কথা জোর দিয়ে বলা। নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ, শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী, ট্রান্সজেন্ডার, উপকূলীয় এলাকার জনগোষ্ঠী সহ পেছনে পড়া মানুষের কথা বলে প্ল্যাটফর্ম। কেননা তাদের পেছনে রেখে দেশ এগিয়ে যেতে পারে না এবং তা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়নের ধরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, গত এক দশকেরও বেশি সময়ব্যাপী একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে তিনটি সরকার দেশ পরিচালনা করছে। তাদের আমলে যে উন্নতি হয়নি - এ কথা কেউ বলতে পারবে না। এ সময়ে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। শিক্ষার হার বেড়েছে, চিকিৎসার লভ্যতাও বেড়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রায় উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সরকার যে শিক্ষা দিল, বিশেষত প্রাথমিক থেকে এইচএসসি পর্যন্ত যে শিক্ষা দিল, সেই শিক্ষা নিয়ে কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা যাচ্ছে? অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যারা ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে, তাদের ১০ শতাংশ মাত্র পাস করে। তাহলে কী শিক্ষা নিচ্ছে তারা? তিনি উল্লেখ করেন, কমিউনিটি হাসপাতাল আছে, উপজেলা হাসপাতাল আছে, কিন্তু সেখানে গিয়ে ডাক্তার পাওয়া যায় না। রাস্তা হচ্ছে, কিন্তু সড়ক নিরাপত্তায় বড় ধরণের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সংকটে পড়ছে।

মানুষের সংকট নিয়ে কিছু বাস্তবতা তুলে ধরে তিনি বলেন, দৈনিক উপার্জন ১ দশমিক ৮০ ডলার বা অন্তত ২০০ টাকা না হলে একজন মানুষ দরিদ্র শ্রেণীতে পড়েন। অথচ চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭০ টাকা। অতএব আয়ই নির্ধারণ করা হয়েছে এমনভাবে যাতে তারা দরিদ্র হিসেবেই থাকেন। এদেশের চা বাগানের মালিকরা ২০০ টাকা দিতে পারে না, অথচ শ্রীলঙ্কা বা কেরালা-তে অন্তত ৫০০ টাকা দিচ্ছে। তারা কীভাবে পারছে? নিশ্চয় তারা উৎপাদনশীলতা বাড়াচ্ছে বা আধুনিকায়ন হচ্ছে। বাংলাদেশ বিগত এক দশক একটা উন্নতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিছু পুরোনো সমস্যা এখনো রয়ে গেছে। আবার একইসাথে কিছু নতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষিত যুবকের অনেকেরই কর্মসংস্থান হচ্ছে না। এদের একটি অংশ মাদকাসক্ত হচ্ছে এবং নানা ধরণের মানসিক চাপের মধ্যে পড়ছে। তরুণ-তরুণীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা আগের চেয়ে বেড়েছে। কেউ কেউ উগ্রবাদের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে। যুব সমাজকে কেন্দ্র করে নতুন ধরণের সমস্যা সামনে আসছে। আবার যুব সমাজের আর একটি অংশ স্টার্টআপ করছে, দাবাতে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে কিংবা গণিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হচ্ছে। মেয়েরা খেলাধুলায় আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে জয় ছিনিয়ে আনছে। অতএব দুই ধরণের যুব সমাজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এক দল এগিয়ে যাচ্ছে, আরেক দল মাদকাসক্ত হয়ে, হতাশাগ্রস্থ হয়ে, উগ্রবাদী চিন্তার মধ্যে ঢুকে বন্দুক নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। হলি আর্টিসানের নৃশংস ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তারা যুব সমাজেরই অংশ। তারা অবস্থাসম্পন্ন ঘরের শিক্ষিত ছেলে।

কর্মসংস্থানের অভাব যুব সমাজের প্রধান সংকট

আলোচনায় যুব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সমস্যার কথা উঠে আসে। অংশগ্রহণকারী তরুণ-তরুণীদের পাশাপাশি বয়স্ক ও প্রবীণরাও নানা বাস্তবতা তুলে ধরেন। তারা জানান, এই এলাকার যুব সম্প্রদায়ের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো কর্মসংস্থানের অভাব। আবার কর্মসংস্থানের জন্য উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। এর ফলে একটি অংশ হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ছে। তাদের কেউ কেউ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। মাদকের ব্যবসার সঙ্গে প্রভাবশালীদের কিংবা পুলিশ প্রশাসনের সম্পর্ক আছে বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেন।

অংশগ্রহণকারীদের কেউ কেউ নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। দলিত সম্প্রদায়ের একজন যুবক জানান, তিনি ভাল ছাত্র ছিলেন। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে তার মা পক্ষাগাতগ্রস্থ হয়ে পড়েন। পড়ালেখা নিয়ে সংকট তৈরি হয়। বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। দোকানে দোকানে কাজ করে তিনি এসএসসি পাশ করেন। এইচএসসি

পরীক্ষার আগে সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন। পরীক্ষার সময় তার মা মারা যান। অনার্সে ভর্তি হয়েছেন। কিন্তু তার উদ্বেগ, পড়াশোনা শেষে চাকরি পাবেন কি না।

আলোচনায় উঠে আসে যে, যারা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, তাদের বেশিরভাগই ঢাকামুখী। ঠাকুরগাঁও-তে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই কম। ঢাকায় গিয়ে তারা বিভিন্ন গার্মেন্ট কারখানায় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ করছেন। বিদেশে যেতে পারছেন খুব কম। ঢাকায় যারা কাজ পাচ্ছেন, তাদের একটি অংশ আবার ফিরে আসছেন। কারণ, তাদের উপার্জন এত কম যে, তারা ঢাকায় জীবন-জীবিকার ব্যয় মেটাতে পারছেন না। যতটুকু আয় হয়, তার পরিবার চলে না। ফেরত এসে কেউ কেউ কৃষি কাজ করে। কৃষি শ্রমে প্রতিদিন পাওয়া যায় ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা। কিন্তু বছরের ১০০ থেকে ১২০ দিন কাজ থাকে। একজন আলোচক জানান, এখানকার চিনি কলগুলোতে যে শ্রমিক ছিল, তা চার ভাগের একভাগে নেমেছে।

একজন কারিগরি প্রশিক্ষক জানান, সরকারি প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হওয়া আদিবাসী বা দলিত শ্রেণীর জন্য দুরূহ। ঠাকুরগাঁও টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে (টিটিসি) গাড়ি চালনা প্রশিক্ষণের জন্য ২৫ জনের ব্যাচ আছে। সেখানে ২০০ থেকে ২৫০ জন আবেদন করে। কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন আসে, যা প্রশিক্ষণার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রভাব রাখে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক এবং সিপিডির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান উল্লেখ করেন, সরকারি লোকজন তো অনেক সময় বলে, প্রশিক্ষণের জন্য লোক পাওয়া যায় না। এর উত্তরে একজন আলোচক জানান, যেসব প্রশিক্ষণের চাহিদা আছে, সেখানে পর্যাপ্ত আসন নেই। যে পরিমাণ আসন আছে, তাতে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষত আদিবাসী ও দলিত শ্রেণীর লোকজন স্থান পান না বললেই চলে।

আদিবাসী একজন যুবক জানান, অনেকে কাজের জন্য ঢাকায় যাচ্ছেন। কিন্তু একটি অংশ আবার ফেরত আসছেন। তার ছোট ভাই এসএসসি পাশ করে ঢাকায় কাজ করতে গিয়েছিলেন। বেতন ৯ হাজার এবং খাবার ৩ হাজার টাকা। জরাজীর্ণ বাসায় থাকতো। তারপরও ঠিকমতো ভরণ পোষণ হতো না। অফিসের কর্মচারী ছিলেন, এখন দিনমজুর। যারা ফিরে আসছেন, তাদের বেশিরভাগই এ কারণে আসছেন। তিনি নিজে ইংরেজি সাহিত্যে এমএম করেছেন এখনও চাকরি পাননি। কোটা তুলে দেওয়ায় আদিবাসীদেরও চাকরি পেতে আরও সমস্যা হচ্ছে বলে অনেকে মত দেন।

সেবাদানে, নিয়োগে দুর্নীতি

পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই জানান, সরকারি বিভিন্ন ধরণের সেবা পেতে তাদেরকে ঘুষ দিতে হয়। কেউ কেউ ঘুষ শব্দটির পরিবর্তে 'চা খাওয়ার' পয়সা দিতে হয় বলে উল্লেখ করেন। অনেকেই জানান, বেসরকারি এমপিওভুক্ত স্কুলের শিক্ষক, কর্মচারী ও পরিচ্ছন্নকর্মীর নিয়োগ টাকা ছাড়া হয় না। পরিচ্ছন্নকর্মীদের এক সময় দলিত শ্রেণীর মধ্যে থেকে নিয়োগ দেওয়া হতো। কিন্তু অন্যরা ঢুকে পড়ছে টাকার বিনিময়ে। একজন বক্তা জানান, চাকরি পেতে ঘুষ লাগে। পরিচ্ছন্নকর্মী পদে তার দুই ভাইয়ের জন্য ১০ লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। আগে অনুরোধ করলে চাকরি হতো। এখন টাকা দিতে হয়।

সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন বাড়ালেও দুর্নীতি কমেছে কি না — এমন প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলেন, আগের চেয়ে কমেনি, বরং বেড়েছে। ঘুষের দাবি বেড়েছে। শিক্ষক নিয়োগ, পুলিশের চাকরি— সব জায়গায় ঘুষ বেড়েছে। মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক নিয়োগেও টাকা লাগে। প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরির জন্যও ঘুষ লাগে। স্কুল কমিটির লোকজন ঘুষ খায়। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতেও টাকা লাগে। কর্মকর্তাদের বেতন বাড়ানো হয়েছিল, যাতে ঘুষ নেওয়ার প্রবণতা কমে। সেই চিন্তা সফল হয় নি।

কেউ কেউ জানান, আদিবাসী বা দলিতরা স্কুলে পরিচ্ছন্নকর্মীর চাকরি করে। সেই চাকরি পেতেও ৭ থেকে ৮ লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয়। দলিত শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট এই চাকরিতে অন্য শ্রেণীর সামর্থ্যবান লোক ঘুষ দিয়ে চাকরি নিচ্ছে। আদিবাসী ও দলিতদের প্রতি অনেকের মানসিক প্রতিবন্ধকতা আছে। চাকরির সাক্ষাৎকার নিতে ডেকে তাদেরকে বের করে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। একজন নারী জানান, দলিত সম্প্রদায়ের স্বজনরা উচ্চ জায়গায় নেই। এ কারণে তারা চাকরি কম পায়। চাকরির ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি হয়। ঘুষ চাওয়া হয়। আরেক তরুণ জানান, আদিবাসীদের মধ্যে অনেকে মেধাবী শিক্ষার্থী। কিন্তু চাকরির পরীক্ষায় তারা টিকছে না। তার ধারণা, এখানে দুর্নীতি হয়। তা না হলে এ গোষ্ঠীর কিছু মানুষ হয়তো চাকরি পেতো।

একজন তরুণ বলেন, ভর্তি এবং চাকরির পরীক্ষার ক্ষেত্রে আগেভাগে প্রশ্নপত্র বিক্রি হয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রও ফাঁস হওয়ার ঘটনা রয়েছে। চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও আগের রাত্রে প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। অপরাধীরা ধরা পড়লেও আদালত থেকে দ্রুত জামিন পেয়ে যাচ্ছে। একজন মুক্তিযোদ্ধা জানান, স্কুল ও মাদ্রাসায় বেশি দুর্নীতি হচ্ছে। এমএলএসএস, আয়া- এসব পদে নিয়োগেও দুর্নীতি হচ্ছে। অর্থ যার আছে, চাকরি তার আছে। আরেক অংশগ্রহণকারী জানান, ইউনিয়ন পরিষদে জন্ম নিবন্ধন সনদের জন্য ২০০ টাকা দিতে হয়। ৬ মাস পর দেখা গেল কোনো প্রয়োজনে সনদটা ইংরেজিতে লাগবে। তখন আবার টাকা দিতে হয়। অনলাইনে জমির খাজনার রশিদের ফি' ১০ টাকা। অথচ নেয় ১০০ টাকা। প্রতিবাদ করলে খাজনা বেড়ে যাবে। তখন বলবে, এই জমি থেকে আয় বেশি।

শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া এবং শিক্ষায় অন্যান্য সংকট

দারিদ্র্য, আর্থিক সংকট এবং সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার কারণে বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ ঝরে পড়ছে বলে অনেকে মত দেন। নারী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ঝরে পড়ার হার বেশি। এসএসসি পাস করার আগে কন্যা শিশুরা ঝরে পড়ছে। বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল নেই। স্কুলের পোশাক কেনাসহ অন্যান্য ব্যয় সংকুলানে অর্থের অভাব রয়েছে।

একজন নারী শিক্ষার্থী জানান, আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকার কারণে স্কুল থেকে অনেক মেয়ে ঝরে পড়ছে। সরকারের উপবৃত্তির টাকায় পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া খুব কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। নিজের সংকটের কথা জানাতে তিনি বলেন, ৬ মাস পরপর ১২০০ টাকা উপবৃত্তি পান। কিন্তু প্রতি মাসে মেস ভাড়া মাসে ২০০০ টাকা। প্রাইভেট পড়তে পারেন না। শুধুমাত্র আর্থিক অবস্থার কারণে অনেকের স্বপ্ন অধরা থেকে যাচ্ছে। করোনার সময়ে স্মার্টফোন না থাকায় পড়াশোনা করতে পারেন নি।

শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অন্য পেশাধারী আলোচকরাও স্কুল থেকে ঝরে পড়ার বিষয়ে কথা বলেন। তারা দারিদ্র্যকে এর প্রধান কারণ মনে করেন। তারা জানান, শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু পরিমাণ এখনো খুবই কম। ঝরে পড়া কমাতে উপবৃত্তির টাকার অংক বাড়াতে হবে। একজন নিজ গ্রামের উদহারণ দিয়ে বলেন, সেখানে মাদক তৈরি ও বেচাকেনায় অনেকে সম্পৃক্ত। শিক্ষা বিস্তারের পথে যা অনেক বড় বাধা। মাদক ব্যবসার সাথে যেসব পরিবার জড়িত, তাদের সন্তানদের মধ্যে স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার অত্যন্ত বেশি।

একজন শিক্ষিকা বলেন, অভিভাবকদের মধ্যে সন্তানকে ভালো স্কুলে ভর্তির জন্য কোচিং নির্ভরতা রয়েছে। অত্যন্ত ছোট বয়সে তাদের অতিরিক্ত পড়াশোনার চাপ দেওয়া হয়। এখন অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য লটারি হচ্ছে। অভিভাবকদের অনেকেই সন্তানের পড়াশোনার বিষয়ে খোঁজ নেন না। তারা সন্তানদের সময় দেন না। তার মতে, বাবা-মাকেই যে পড়াতে হবে, তা নয়। তবে সন্তান কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে মিশছে - এ বিষয়ে বাবা-মার দায়িত্ব আছে।

একজন শিক্ষক জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি কিছু বিধিনিষেধের কারণে কিছু শিক্ষার্থীকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। তাদেরকে শাসন করা যাচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের গায়ে হাত দিয়ে শাসন করলে তার আচরণের উন্নতি হবে মনে করেন কি না জানতে চাইলে ওই শিক্ষক বলেন, তিনি সেটা বোঝাতে চাইছেন না। তিনি জানান, শিক্ষার্থীদের একটি অংশ এখন অনেক উগ্র হয়ে গেছে। বিশেষত করোনার সময়ে স্কুল বন্ধ থাকায় তারা দীর্ঘদিন অন্য ধরণের জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এর একটা প্রভাব তাদের সাম্প্রতিক আচরণে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে দেখা যায়, তারাও এক প্রকার নিরুপায়। একজন অভিভাবক জানান, ক্লাসে শিক্ষার্থী নেই, পরীক্ষার্থী আছে। তারা শিখছে না। পরীক্ষার প্রয়োজনে পড়ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পেছনে তুলনামূলক ব্যয় কম। কোচিং সেন্টারের নোটে ভুল ভ্রান্তি থাকে।

একটি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনে করেন, শিক্ষকদের মধ্যে বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য দূর করতে হবে। শিক্ষকের পেটে ক্ষুধা থাকলে তিনি ভালো পাঠদান করতে পারবেন না। তিনি জানান, ঠাকুরগাঁও জেলায় ৪২২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে সরকারি বিদ্যালয়ে সংখ্যা মাত্র ৫ টি। সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জীবনযাপনে অনেক তফাৎ। সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দুটি ঈদে পূর্ণ বোনাস পান। বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পান মাত্র ২০ শতাংশ।

শিল্পের সম্ভাবনা কাজে লাগানো হচ্ছে না

কৃষিপ্রধান এ অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্পের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে ভারতের সীমান্তবর্তী হওয়ায় স্থলবন্দর দিয়ে সেদেশে পণ্য রপ্তানির সম্ভাবনাও রয়েছে। কিন্তু এসব সম্ভাবনা কাজে লাগানো হচ্ছে না। উদ্যোক্তারা গ্যাস সহ অন্যান্য অবকাঠামো চান। কিন্তু ঠাকুরগাঁও-এ গ্যাস নেই। তারা বলেন, অনেক সম্ভাবনাময় এলাকা হলেও ঠাকুরগাঁও বৈষম্যের শিকার। এখানে বড় শিল্প-কারখানা নেই। ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ছাড়াও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা একই মত পোষণ করেন। ঠাকুরগাঁও-এ বিনিয়োগের সুবিধা কম। বিমানবন্দর বন্ধ হয়ে আছে। তরুণরা ব্যাংকে ঋণের জন্য গেলে তেমন সমর্থন পান না। কেউ কেউ মনে করেন, কৃষিভিত্তিক শিল্প হচ্ছে না রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে। জনপ্রতিনিধিরা জাতীয় পর্যায়ে এলাকার কৃষিভিত্তিক শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে তেমন আলোচনা করেন না। এক পর্যায়ে সঞ্চালক জানতে চান, ঢাকার বাইরে শিল্প স্থাপনে কর অবকাশ সুবিধা রয়েছে। ঠাকুরগাঁও-এর ব্যবসায়ী চেম্বারগুলো এ সুবিধার কথা জানে কি না এবং জানলে তাদের দিকে থেকে কোনো উদ্যোগ আছে কি না। ব্যবসায়ীদের মধ্যে এর উত্তরে একজন জানান, গ্যাস না থাকায় এ এলাকায় এ সুবিধা নিতে উদ্যোক্তারা আগ্রহ দেখান না।

আলোচনায় আরও উঠে আসে যে, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এখানকার স্থলবন্দর ঠিকমতো কাজ করছে না। এখানকার উদ্যোক্তাদের ভিসা দেওয়া হচ্ছে না। একজন নারী উদ্যোক্তা জানান, হস্তশিল্পের প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার। বুটিকের কাজ করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে নেপালে মেলায় অংশ নিয়েছেন। সেদেশে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা রয়েছে। বিশেষ করে যেমন বেড কাভার, শাড়ি, থ্রি-পিছ সহ কিছু পণ্য। কিন্তু তিনি প্রথমে ঢাকায় যান, তারপর উড়োজাহাজে যাওয়া আসা করেন। তিনি মনে করেন, ভারতের ওপর দিয়ে স্থলপথে তৃতীয় দেশে ট্রানজিট সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে তার মতো অনেকেই নেপালে কম খরচে পণ্য রপ্তানি করতে পারবেন। এর ফলে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়বে।

একজন তরুণ জানান, ঠাকুরগাঁওয়ে এক সময় প্রচুর পরিমাণে আখ চাষ হতো। এ কারণে এ এলাকায় বেশ কয়েকটি চিনিকল গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে আখ চাষ নেই বললেই চলে। এ কারণে চিনিকলগুলো অর্ধমৃত। চিনিকলের জমি পড়ে আছে। কোনো কাজে লাগে না। এসব জমি ভূমিহীন এবং পিছিয়ে পড়াদের মাঝে বরাদ্দ

অথবা যুগোপযোগী শিল্প-কারখানা স্থাপন করে কাজে লাগালে এই এলাকার মানুষের কর্মসংস্থান বাড়বে। ধান না হলে সেখানে সবজিও চাষ করা যাবে। একজর ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা জানান, তিনি মুরগি পালন করে বিক্রি করতেন। কিন্তু করোনার সময় লোকসানে পড়েন। এখন গরু পালন করেন। কিন্তু এক লাখ টাকা ঋণের জন্য কৃষি ব্যাংকে আবেদন করেও জমির দলিল না থাকায় তিনি ঋণ পান নি।

ভূমি নিয়ে নানা সমস্যা

আলোচকরা জানান, এই অঞ্চলে ভূমিকেন্দ্রিক বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে। ভূমি দস্যুরা জোর করে জমি দখল করছে। আদিবাসীরা দখলের শিকার হচ্ছে বেশি। তাদের পূর্ব-পুরুষদের অনেকেই ঠিকমতো কাগজপত্র সংরক্ষণ করতে পারেনি বলে দখলকারীদের জন্য সুবিধা হচ্ছে।

ভূমি সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনায় ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ভারতের একটি উদহারণ দিতে গিয়ে বলেন, সেদেশের সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারায় জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ছিল। সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিল, স্থানীয় লোকের বাইরে কেউ জমি কিনতে পারবে না। ভারত এ ধারাটি সম্প্রতি বাতিল করেছে। আমাদের পার্বত্য এলাকায়ও কিন্তু একই ধরণের পরিস্থিতি হয়েছে। যেমন- খাগড়াছড়িতে এখন বাঙ্গালিরা বেশি। মনে রাখতে হবে, যদি সুরক্ষা দিতে হয়, তাহলে অসমভাবে একটু বাড়তি সুযোগ দিতে হবে। না হলে তারা কোনো দিন সমান হতে পারবে না। সমতা আনতে হলে পিছিয়ে পড়া মানুষের পক্ষে বৈষম্য করতে হবে। রাঙ্গামাটিতে বা খাগড়াছড়িতে স্থানীয়দের ভূমি স্বার্থ রক্ষা করতে হবে।

একজন আলোচক বলেন, জেলা পর্যায়ের আমলাদের বাংলোগুলো অনেক জায়গা জুড়ে। বৃটিশ আমল থেকে এ ব্যবস্থা। এতটা জমি একজন কর্মকর্তার প্রয়োজন নেই। যেহেতু দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ভূমির সংকট রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট জায়গায় উচ্চ ভবন করে দেওয়া যেতে পারে। অযথা রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহার করার দরকার নেই।

ক্রীড়া উন্নয়নে মনোযোগ কম

আলোচকরা জানান, ঠাকুরগাঁও জেলা শহরে শুধু একটি ষ্টেডিয়াম আছে। পুরো এলাকায় খেলার মাঠের অভাব রয়েছে। একটি ফুটবল টিম গঠনের জন্য যে সহায়তা দরকার, যে বরাদ্দ আসে সেটা তার জন্য যথার্থ নয়। সরকারের কিছু সমর্থন রয়েছে। জেলা পরিষদ কিছু সহায়তা দেয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে খেলার উপকরণ সংগ্রহ করা হয় ব্যক্তিগতভাবে। সরকারের অগ্রাধিকার এখানে কম।

স্থানীয় একজন কাউন্সিলর বলেন, প্রতিটি জেলায় একটি ইনডোর ষ্টেডিয়াম হওয়া উচিত। একই সাথে একটি ব্যায়ামাগার থাকা উচিত। চর্চার জায়গা নেই। তিনি স্থানীয় সংসদ সমদস্যসহ বিভিন্ন পর্যায়ে এ বিষয়ে অনুরোধ করেছেন।

সাফল্যের উদহারণ

একজন অংশগ্রহণকারী জানান, ঐকান্তিক চেষ্টা ও উদ্যোগ থাকলে অবশ্যই যে সফল হওয়া যায়; তার উদহারণ ঠাকুরগাঁও-এ আছে। এবারের সাফ নারী ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন দলের দু'জন সদস্য এখানকার। তারা যে ক্লাবের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন সেই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাকে তিনি পরিচয় করিয়ে দেন। উপস্থিত সবাই ওই ফুটবল সংগঠককে করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানান। আলোচকরা জানান পিছিয়ে পড়া মানুষদের সহায়তায় স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা ইএসডিও প্রচুর কাজ করছে।

পিছিয়ে পড়াদের চিহ্নিত করে বেশি সুযোগ দিতে হবে

আলোচনার এক পর্যায়ে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, অনেক সময় বলা হয়, বাংলাদেশে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু বলে কিছু নেই। কেউ কেউ বলেন, দলিত বলে কিছু নেই, হরিজন বলে কিছু নেই। আদিবাসী বলে কিছু নেই। সরকার এখন 'আদিবাসী' শব্দ ব্যবহারের বিপক্ষে। তারা হয়তো মনে করেন, আদিবাসী হলো, একটি স্থানে যারা আদি থেকেই বসাবস করছে। কিন্তু জাতিসংঘের সংজ্ঞা ভিন্ন। আদিবাসী হলো এমন একটি জনগোষ্ঠী যার একটি ভাষা বা সংস্কৃতি বা কিছু আইনি ব্যবস্থা আছে, যা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কারণে বিপন্ন হয়ে যায়। তারা এমন একটি জনগোষ্ঠী যাদের সংস্কৃতি আছে, ভাষা আছে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ভূমি ব্যবস্থাপনা আছে এবং তারা বিভিন্ন কারণে বিপন্নতার সম্মুখীন হয়। তিনি বলেন, যদি আদিবাসী, সংখ্যাগুরু কিংবা সংখ্যালঘু শব্দ ব্যবহার না করা হয়, তাহলে নারীর কথা একইভাবে আসবে। চিহ্নিত করে পৃথক না করলে সমর্থন দেওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে। স্বীকৃতি দিতে হবে যে তারা বিপন্ন। দুটো মানুষের মধ্যে যদি বৈষম্য থাকে, তাহলে তাদের সমান সুযোগ দিয়ে বৈষম্য দুর করা যায় না। যে পিছিয়ে আছে, তাকে বেশি সুবিধা দিয়ে উপরে তুলতে হবে। সুতরাং নীতি প্রয়োগের জন্য এ ধরণের আলাদা চিহ্নিত করার প্রয়োজন রয়েছে। এটি দলিত, পাহাড়ী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, নারী, প্রাকৃতিকভাবে বিপর্যয়ের মুখে থাকা জনগোষ্ঠী — সবার জন্য সত্য।

সুনির্দিষ্ট সুপারিশ

আলোচনায় বেশ কিছু সুপারিশ উঠে আসে। কেউ কেউ জাতীয় বাজেটে সমতল এলাকার আদিবাসীদের জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ দাবি করেন। অনেকে আদিবাসীদের জন্য চাকরিতে ৫ শতাংশ কোটা পুনর্বহালের দাবি করেন । কেউ কেউ আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি ধরে রাখার জন্য একটা একাডেমি প্রতিষ্ঠার দাবি করেন। অনেকেই শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা বাড়ানো, মাদকাসক্তি নির্মুল, পর্যাপ্ত কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ এবং গ্রামে ছেলেমেয়েদের খেলার ব্যবস্থা করার দাবি করেন। আলোচনায় বিমানবন্দর চালু, কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণসহ আরও কিছু দাবি উঠে আসে । কয়েকজন আলোচক বলেন, ঠাকুরগাঁও-এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা হয়েছে, কিন্তু জমি অধিগ্রহণের কাজ স্থগিত রয়েছে। নাগরিক চাপ তৈরি করতে হবে। এখানে কৃষিপণ্যের ইপিজেড স্থাপন করতে হবে। প্রত্যেক জেলায় বিজ্ঞান জাদুঘর তৈরি করতে হবে। একজন শ্রমিক নেতা জানান, পরিবহন শ্রমিকদের অনকেই দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তাদের জন্য সরকারি কোনো বরাদ্দ নেই। সরকারি শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে তারা বঞ্চিত। কারণ তারা নিয়োগপত্র পান না। সরকার থেকে এ জন্য উদ্যোগ নিলে পরিবহন মালিকরা নিয়োগপত্র দেবেন।

আলোচকরা বলেন, পিছিয়ে পড়া মানুষকে এগিয়ে নিতে জোর দিতে হবে শিক্ষার ওপর। শিক্ষার দিক থেকে এগিয়ে গেলে সব জায়গায় ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে। কর্মসংস্থান হবে। প্রাথমিক শিক্ষার দিকে বেশি নজর নিতে হবে। ভিত্তি শক্ত হলে কেউ ঝরে পড়বে না। কাউকে পিছিয়ে রেখে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয় । পিছিয়ে পড়া ব্যক্তির এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। দলিত সম্প্রদায়, আদিবাসী, ট্রান্সজেন্ডার, চা শ্রমিকসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতি সমাজের অন্য জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে বৈষম্য বিলোপ আইন দ্রুত পাস এবং বাস্তবায়ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সমাজে অনেক ধরণের বৈষম্য রয়েছে, যা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদাকে যখন বিবেচনায় নেওয়া হয় না, তখন পুরো সমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি সবাই সহানুভূতি দেখায়, কিন্তু তাদেরকে সমান মনে করে না অনেকেই।

তারা আরও বলেন, তরুণ সমাজ শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে নানা রকমের অপসংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়ছে। উগ্রবাদী বা সাম্প্রদায়িক চিন্তায়

জড়িয়ে পড়ছে। তাদের মানসিক বিকাশ ঠিকমতো হচ্ছে না। এটি নতুন সামাজিক সমস্যা। এগুলোকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে এসব প্রবণতার প্রতিরোধে সম্মিলিত উদ্যোগ গড়ে তুলতে হবে। সব পর্যায়ে সচেতনতা বাড়ানো দরকার। একজন আলোচক বলেন, বয়স্ক নাগরিকদের প্রতি খেয়াল কম। তাদের কোনো বিনোদনের জায়গা নেই। তাদের কোনো বসার ব্যবস্থা নেই। তারা ভাল পরামর্শ দিলে সমাজ এগিয়ে যাবে। এ জন্য তাদের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

এ আয়োজনের সহযোগী সংগঠন হেকস্ ইপার প্রতিনিধিরা বলেন, সমস্যাগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং যথাযথ জায়গায় সমাধানের জন্য জানাতে হবে। ফলো আপ করতে হবে। যখন এরকম জমায়েত হয়, তখন সবাই কথা বলেন। কিন্তু পরে সমস্যা সমাধানে নিজেদের এগিয়ে আসতে হবে। সমাধানের সম্ভাব্য উপায়সমূহ নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সুনির্দিষ্ট সমাধানের পথ অনুসন্ধান করতে হবে।

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন: জাকির হোসেন
সিরিজ সম্পাদনায়: অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক: অভ্র ভট্টাচার্য

আয়োজক

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

সহযোগিতায়

HEKS EPER Bread for all.
Eco-Social Development Organization (ESDO)

সহযোগী প্রতিষ্ঠান

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE
Manusher Jonno Foundation
TRANSPARENCY INTERNATIONAL BANGLADESH
Social movement against corruption
WaterAid
UNDP

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs Citizen'sPlatformforSDGsBangladesh BDPlatform4SDGs

নভেম্বর ২০২২

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০ । ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net । ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net